দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়

জাকিয়া রউফ চৌধুরী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Dinguli Mor Sonar Khacai by **Zakia Rauf Choudhury**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 978 984 95130 5 6

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

আমার গুরু, আমার পথের দিশারি, আমার বাতিঘর।
যার হাত ধরে এতটা পথ আসা। এত বছরের চেনা মানুষটাকে
করোনার বন্দিজীবনে আবার নতুন করে চেনা।
যার সঙ্গে এক জীবন কাটিয়ে দিয়ে আরেকটা জীবন কাটানোর
ব্যাকুলতা!

এ. রউফ চৌধুরী, পরের জীবনে তুমি আমাকে ঠিক চিনে নেবে তো?

ভূমিকা

এ যেন সোনার খাঁচায় বন্দি থাকার দিনগুলি। কী এক অদ্ভুত অসুখ এলো আমাদের জীবনে। যে রোগের কোনো দাওয়াই নেই, পথ্য নেই। যে রোগে আক্রান্ড় হলে নির্বাসনে যাও। যে রোগ থেকে নিজেকে বাঁচার জন্যও স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নাও। কর্মব্যস্ড় জীবনে কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এবার হাঁপিয়ে গেলাম ছুটি কাটাতে কাটাতে। অবসরেরও যে অবসাদ আছে, বিশ্রামেরও যে ক্লান্ড়ি আছে— কেইবা জানত!

ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল পুরো পৃথিবী। আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও বাধ্য হলো লকডাউনে যেতে। আমরা দুই বুড়োবুড়িকে রেখে সন্ড়ানেরা সবাই চলে গেল অন্য কোথাও থাকতে। এই অসুখে যে ধূসর পাতারাই ঝরছে বেশি! দুজন মিলে আবার যেন নতুন করে সংসার শুরু করলাম। শুধু আমরা দুজন। কাজে সহায়তা করার জন্য যারা ছিল, তাদেরও অনেকেরই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের অসুবিধা যেন না হয় এমন সব আয়োজনই ছিল। কিন্তু তবু তো বন্দিজীবন। খাঁচা সোনার তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ড় সেটা খাঁচাই তো!

তবু মনে হয়, এই সময়টার আমাদের দরকার ছিল। এবারের করোনায় যে জীবনের নতুন ধারাপাতও পড়তে শিখলাম। এ যেন ছিল নিজেকে, নিজেদেরকে পুনরাবিষ্কার করাও। চোখের সামনে কত মানুষ স্বজনহারা হলো। দেশের কিছু শ্রেষ্ঠ সন্ড়ানকে আমরা হারালাম। কত মানুষ বিপন্ন হয়ে উঠল। কাজ হারাল। কতজনের শেষ সঞ্চয়ে টান পড়ল!

নতুন করে অনুভব করলাম, আমরা মানুষেরা প্রকৃতির ওপর কী অত্যাচারটাই না করি! এবারের করোনায় প্রকৃতি যেন তারই প্রতিশোধ নিল। আমাদের খাঁচাবন্দি করে প্রকৃতি পাখিকে দিলো উন্মুক্ত আকাশ। ডলফিনকে দিলো নির্ভয় সৈকত। গাছকে দিলো সবুজ ছড়ানোর স্বাধীনতা। মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে প্রকৃতি দেখিয়ে দিলো, এই পৃথিবী শুধু মানুষের একার নয়।

করোনার বন্দি সময়টায় কত স্মৃতি, কত ভাবনা এসে ভিড় করেছে মনের মধ্যে। ভাবলাম, এই সময়টাকে ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করে রাখি। ভাবনারা কালো অক্ষরে রূপ নিল। সেখান থেকেই এই বই।

এই ভূমিকা যখন লিখছি, তখনো করোনা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়নি। ভ্যাকসিন আসবে-আসছে করছে। শীতে করোনার নতুন ঢেউ দেখছে পৃথিবী। যদিও পৃথিবী তার আপন গতিতেই এগিয়েছে। মানুষও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে বাধ্য হয়েছে নিত্যদিনের কাজ শুর করতে। নতুন শব্দযুগল পেয়েছি আমরা— নিউ নরমাল।

করোনা থেকে পাওয়া শিক্ষাটা যেন আমরা ভুলে না যাই, এটাই প্রার্থনা। আর প্রার্থনা, পৃথিবীর সবার মঙ্গল হোক। যখন 'সবার' বলছি, তার মধ্যে শুধু মানুষ নেই; আছে গাছগাছালি-পশুপাখি থেকে ছোট্ট পতঙ্গও। এই পৃথিবী আমাদের সবার হোক!

জাকিয়া রউফ চৌধুরী
গুলশান, ঢাকা।

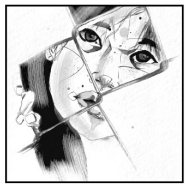

মানুষটাকে দেখছি এতগুলো বছর ধরে। প্রথম যখন তার হাতে হাত রেখে নির্ভয়ে পথ চলতে শুর করেছিলাম, এত্তটুকুন একটা মেয়ে ছিলাম আমি। স্কুলের গি যে মাত্রই পেরিয়েছে। বেণি দোলানো এক কিশোরী। চোখে স্বপ্নের মায়াময় ঘোর। আমার একচিলতে উঠোনে অকস্মাৎ দমকা বাতাসের মতো তিনি এলেন। এখনো তাকে দেখলে বোঝা যায়, তার ণ্যে কী ব্যক্তিত্বময় সুপুর ষ ছিলেন। লম্বাচওড়া কাঁধ, অ্যাডভেনচারপ্রিয়। ভয় শব্দটা যার অভিধানে নেই। যা জয় করতে চান, জয় করেই ছাড়েন। আমার মন জিতে নিতেও তার একটুও বেগ পেতে হয়নি।

১৯৬৬ সালের একদিন, আমি মাত্রই ম্যাট্রিক পাশ করেছি আগের বছর, মানুষটা হুট করে বললেন, চলো বিয়ে করে ফেলি! যে সময়ের কথা বলছি, সে যুগে নিজেরা পছন্দ করে নিজেরাই বিয়ে করে ফেলাটা রীতিমতো দুঃসাহসিক এক কাজ ছিল। কিন্তু ওই যে, তিনি যা চেয়েছেন, প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করেছেন। আমার অনামিকায় নাজ জুয়েলার্স থেকে কেনা ৭৮ টাকা দামের আংটিটা পরিয়ে দিয়েছিলেন। অনামিকা, যে আঙুলের নামই নেয়, সেই আঙুলেই রচিত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থবহ সম্পর্ক!

অনেকে বিশ্বাস করে, অনামিকার সঙ্গে হার্টের সরাসরি একটা যোগ আছে শিরা-উপশিরার মধ্যে। আমারও খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে

করে কথাটা। না হলে ৫৪ বছর আগে যে আংটির বন্ধনে বাঁধা পড়লাম; কই আজও তো এতদিন পরও তার প্রতি মমতা একবিন্দুও কমলো না!

আমার কথাগুলো পড়ে কেউ হয়তো মনে করবে, প্রেমের কথা বলছি, অথবা প্রেমের গল্প বলছি। আসলে এটা শুধু প্রেমের কথা নয়, প্রেমের গল্প নয়। এটা মানুষের জীবনের এক একটা অধ্যায়। এক একটা অধ্যায়ে এক একটা মানুষ, এক এক ধরনের কথা বলে। এক একরকম করে চিন্ড্রা করে। প্রেম হয় প্রথম জীবনে। পরের জীবনে এটা আর প্রেম থাকে না। হয়ে যায় আস্থা, বিশ্বাস আর নির্ভরতা।

আমাদের প্রথম জীবনটা শুর“টা একদম একরকম হয়। দুজন দুজনের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। ক্রমে ক্রমে এই আকর্ষণ, সেই ভালোবাসাটা বাচ্চার ওপর চলে যায়। মানুষ, তারও সংসার পাখির বাসার মতোই। বাচ্চারা বড়ো হতে হতেই ডানা পায়, উড়ে যায়। তাদেরও পাখির বাসা হয়। ছানাপোনা হয়। তখন বুড়ো আমাদের অপত্যস্নেহের সবটা নাতি-নাতকুরদের জন্য। স্নেহ যে সব সময় নিম্নমুখী।

একটা মানুষের সাথে অনেকদিন থাকলে বোঝা যায়, সেই প্রথম জীবনে তাকে যেরকম চিনেছি, সেটাই শেষ চেনা নয়। পরের জীবনে যা করেছি, যা দেখছি যা বুঝছি, সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট। প্রথম জীবনটায় অনেক ঝগড়া থাকে, উত্থান থাকে, পতন থাকে। পরস্পরকে জানা-বোঝার দায় থাকে। আর থাকে ঈর্ষা! ভালোবাসা ঈর্ষা ছাড়া হয় নাকি! তুমি কার দিকে তাকিয়ে ছিলে, কার দিকে চেয়ে এক কাপ কফি খেয়েছিলে।

আজকে যদি তিনি কারও সঙ্গে বসে কফি খান, আমি মনে হয় খুশি হবো। তোমার ভালো লেগেছে এক কাপ কফি তুমি কারও সঙ্গে

বসে খেয়েছ? সেই সময়টা তুমি তখন আমায় দাওনি কেন? এটা আগে হলে কী তুমুল বেঁধে যেত সংসারের মধ্যে। কিন্তু এখন সেরকম কিছু মনে হয় না। হয়তো ঘটে না বলেই মনে হয় না।

এমন তো নয়, একদমই আমরা কখনো কারও দিকে তাকাইনি, কারও সঙ্গে বসে লাঞ্চ করিনি, ডিনার করিনি। আমাদের জীবনে চলতে গেলে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। যার সাথে সংসার বেঁধেছি, তাকে নিয়ে যে জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছি, মাঝে মাঝে যে কেউ ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে আসেনি, তা তো নয়। আমাদের জীবনের আঙিনায় এমন কারও কারও ছায়া তো পড়ে। কিন্তু সেই ছায়া দাগ রেখে কি যায়?

আমার এখনো সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে। স্কুলবাসের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, চোরা চাহনিতে বেশ বুঝতাম, আমারই অপেক্ষায়। সেই কবেকার ছোটোবেলার কথা, তখন বোধহয় ক্লাস নাইনে বা টেনে পড়তাম। পরে শুনেছিলাম ছেলেটা ডাক্তারি পড়ে। মাঝে মাঝে ভাবি, সেই ছেলেটা, যাকে এখন আপনি বলেই সম্বোধন করতে হবে, তিনি কেমন আছেন? পরে কি মস্ড় ডাক্তার হয়ে গেছেন? কারও জন্য অপেক্ষায় ভীর“ বুকে দাঁড়িয়ে থাকার সেই প্রথম কৈশোরের রোমাঞ্চকর স্মৃতি কি আজও মনে পড়ে তার?

জীবনের এই বেলা ফুরাবার বেলায় এসে এত কিছু দেখার পর বুঝতে পারলাম, শেষের জীবনটাই মানুষকে পূর্ণতা এনে দেয়। বোঝার ক্ষমতা দেয়। আজ আমি পরিপূর্ণ। এতগুলো বছর একটা মানুষের সঙ্গে কাটাতে পারাও তো আল্লাহর বিশেষ রহমত।

আজ আমি ওনাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। তিনি আমাকে কতটুকু পেরেছেন তা কখনো জিজ্ঞেস করিনি। তারপরও মনে হয়, উনি পেরেছেন। করোনার এই সময়ে তো আরও

বেশি করে তা মনে হচ্ছে। তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দিতে জানতেন যিনি, সেই তিনি আমার ওপর এখন কতটা নির্ভরশীল! শিশুদের মতো অসহায় চাহনি নিয়ে তাকান, মোমের মতো হৃদয়টা গলে যায় আমার। এই নির্ভরতাই তো ভালোবাসা!

সব সময় ইতিবাচক কিছু খুঁজে নিতে চাই বলে করোনার মধ্যেও ভালো কিছু পেয়েছি। সংসারজীবনে যা কিছু ফেলে এসেছিলাম, আবার ফিরে পেতে শুর‍ু করলাম। আগে আমরা পরিবারের সবাই কত কাছে থেকেও যেন দূরে ছিলাম। যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত। করোনার কারণে আমাদের দুই বুড়োবুড়িকে রেখে বাকিরা চলে গেল, যেন করোনা আমাদের সংক্রমিত করতে না পারে। এই দূরত্ব এক অর্থে আমাদের আবার কাছে নিয়ে এলো। এখন প্রতিমুহূর্তে আমরা সবাই সবার খোঁজ নিচ্ছি।

আগে আমরা এমনভাবে ভাবতাম না। এখন ভাবি। হারাবার ভয় করছি বলেই সবাইকে আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করছে। শুধু নিজের বলে নয়, অন্যেরও খোঁজখবর রাখছি। অন্যেরা সবাই ভালো আছে তো? আমার পাশের বাসার লোকটা ভালো আছে তো?

প্রেমের একটা বয়স থাকে। বয়সটা চলে গেলে প্রেমের রং বদলায়। তখন কি প্রেম থাকে না? থাকে। কিন্তু সেটা অন্যরকম প্রেম। সে প্রেমটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। একজন একজনকে বুঝতে পারা। বলে না দিলেও আমি যেমন বুঝি কোন সময়ে উনি কী চাইছেন। উনি যখন কথা বলেন, তার চেয়ে আমি যেন বেশি বুঝতে পারি, উনি যখন মনে মনে কিছু ভাবছেন।

সেই প্রথম জীবনে যখন সংসার শুর‍ু করেছিলাম দুজনে মিলে, আবার সেই সংসারে ফেরত এসেছি। রোজকার রান্না দেখি। রোজকার বাজার দেখি। কী খাওয়া হবে, নাস্ত্রটা কী হবে। যেটা থেকে এক

সময় দূরেই সরে গিয়েছিলাম। আবার নতুন করে দেখা শুর‍ু করেছি।

কোন ওষুধটা খেলে তোমার ভালো হবে? কোন কাপড়টা তুমি পরবে? তোমার চুলটা ঠিক করে কাটা হয়নি, চুলে কলপ দাওনি, চুলটা বেশি সাদা হয়ে গেছে। ছোটোখাটো কিন্তু আসলে অনেক বড়ো এই বিষয়গুলো ভুলেই গিয়েছিলাম জীবনের ব্যস্ততায়। আবার সব ফেরত পেয়ে গেছি। গল্প করতে পছন্দ করতাম, তখন তো তুমি গল্প করার সময় দিতে না। এখন আবার তুমিই গল্প করতে চাইছ। এত গল্প করো, এত কথা বলো, ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করো। খেতে সাধলে ঝগড়া করো। খেতে বসলে নানা অজুহাত, 'তুমি কি আমাকে খাইয়ে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবা?' বলুন তো, বাঁচানোর সাধ্য কি আমার আছে? তাকে বলি, 'আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। যিনি ওপরে আছেন, তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি শুধু তার কাছে প্রার্থনা করি, দোয়া করি, আল্লাহ, তুমি তাকে হায়াত দাও। আমার জীবন থেকে আয়ু নিয়ে তুমি তাঁকে বাচিয়ে রাখো।'

আমি একা একা থাকার কথা চিন্তাও করতে পারি না। আমি একা থাকতে পারব না, আমার খুব কষ্ট হবে। এই অনাগত নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে আমি এখনই ভয়ে শিউরে উঠি। কেমন করে আমি একা থাকব তোমাকে ছাড়া?

প্রতিদিনই ভাইবোনেরা ফোন করে বিদেশ থেকে খবর নিত। ওরাও একই অবস্থায় আছে। ওরা পেশায় চিকিৎসক বলে ওদের নিয়ে ভয়টা আরও বেশি। ওরাই তো করোনার সবচেয়ে সম্মুখসারির যোদ্ধা। ছোটোটা দুলাল, ও ডাক্তার, ওর ছেলে নাভিদও ডাক্তার। নাভিদ ভীষণভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। বয়স কম বলে সেযাত্রায় রক্ষা পেয়ে যায়।

ওদের মধ্যে একজন চিকিৎসক নয়, তার আবার খুব বাজে

রকমের ডায়াবেটিস। ওকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। শুধু আল্লাহকে বলি, 'আল্লাহ, এত ভালো ছেলে, তুমি ওকে বাঁচিয়ে রেখো।' মুর্শেদ, তোকে যে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তুই তোর যত্ন নিস। নিজের দিকে খেয়াল রাখিস।

খুব কপাল ভালো আমার। তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন চলে গেছে, দুটো ভাই আছে। এমন ভাই যেন সবাই পায়। যারা ভোর, সন্ধ্যা, রাত্রি তিনবেলা আমাকে খোঁজ নিচ্ছে। ওরা আমার সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। তাদের জন্যও মায়া হয়। নারীহৃদয়, তার হৃদয় তো মায়ার অনিঃশেষ জলে ভরা একটা কুয়ো। যতই জল তোলো, ফুরোবার নয়। কিন্তু বেশিরভাগ মায়া ওই একটা মানুষের জন্যই।

আমি বলি আমার স্বামীকে, 'তুমি ফোনে থাকো না কেন? দেখবা ফোনে কথা বললে অনেক সময় কেটে যায়। তোমার ভাইবোনের সাথে গল্প করো, কথা বলো। আমি তো কথা বলি, গান শুনি ওদের সাথে। ওরা গান পাঠায়, আমি শুনি। তোমাকেও তো শোনাই। কিন্তু ওনার সবকিছুতে বিস্বাদ চলে এসেছে। উনি আপন শক্তিতে জ্বলে উঠতে পারছেন না।

আমি নিজেও ভয় পাচ্ছি। চাচ্ছি যে আমাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই আবার আমার কাছে ফেরত আসুক। আমরা আবার একসাথে হই। ওরা যে বাইরে বাইরে থাকছে। এই করোনা নামের আপদটা কবে যাবে! শুধু তো মৃত্যুতে নয়; কতভাবে এই রোগ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে পরস্পর থেকে! যে অসুখে পড়ে, তারই তো প্রিয়জনের সঙ্গ সবচেয়ে বেশি জরুরি। অথচ এ এমন এক অসুখ, অসুস্থ হলে তাকে একঘরে করে ফেলো!

সতর্কতার জন্যই আমাদের এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ছেলেমেয়েদের

ব্যবসা দেখতে হচ্ছে, অনেকের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে। তাই ওরা আমাদের কাছে ভেড়ে না। পাছে আমাদের কিছু হয়ে যায়। কিন্তু মনটা আকুলিবিকুলি করে। শূন্য বাড়িটা খাঁখাঁ করে।

আমার ঘর সকালবেলা যদি পরিষ্কার করে মুছি, ময়লা করার লোক নেই। আগে একটু ময়লা হলে বিরক্ত হতাম। এখন মনে হয়, ইস, কেউ যদি ঘরটা ময়লা করত! ফ্রিজের খাবার পড়ে থাকে। রান্না করি না। খাবারটা খাবে কে? খাওয়ার লোক কই? কষ্ট হয়। আগে একদিন খাবার রান্না করলে সব শেষ হয়ে যেত। এখন শেষ হয় না, পড়ে থাকে।

রান্না করাটাও কমিয়ে দিয়েছি। যখন কাজের ছেলেটা এসে বলে, 'কী রান্না করব খালাম্মা?' বলি, 'ঠিক দুটো ঝিঙে রান্না করবি। এইটাই খাব, আজকে আর কিছু খাব না রে।' দুটো ঝিঙে দিয়েই আমার দুপুরের খাবার হয়ে যায়। এখন আর টেবিল ভরতি তরকারির দরকার হয় না।

টেবিলের দুই প্রান্তে আমরা দুই বুড়োবুড়ি। জীবন আরও বিপন্ন বলেই জীবনের এই প্রতিটা মুহূর্ত আরও বেশি মূল্যবান। ঘড়ির প্রতিটা কাঁটা টিকটিক করে জানিয়ে দিচ্ছে ফুরিয়ে যাওয়ার ক্ষণ। এর মধ্যে আমার পরম পাওয়া, মানুষটার একান্ত সঙ্গ। সারাজীবন তিনি কাজের সঙ্গে প্রেম করেছেন। এত কাছে ওনাকে কখনো পাইনি। এত ভালোভাবে কখনো দেখিনি। আল্লাহ আমাকে সেই দেখার সুযোগ দিয়েছে। যত্ন করার সুযোগ দিয়েছে।

আমি ওনাকে কখনো অবহেলা করেছি, এই অভিযোগ উনি কখনো করতে পারবেন না। আমার চাওয়াকে বিলীন করে দিয়েছি তার চাওয়ার কাছে। তবু মনে খেদ থেকে যায়। মনে হয়, যেটুকু করেছি সেটা পর্যাপ্ত নয় বোধহয়।

তাই হয়তো এমন একটা সময় আল্লাহ আমাকে দিয়েছে। একটা বেবির মতো, একটা বাচ্চার মতো ওনাকে দেখে রাখছি। একটা মানুষ যখন বাচ্চা হয়ে যায়, তখন তাকে যেভাবে যত্ন করতে হয়, সেভাবেই দেখছি। যতদিন থাকেন, যেন সুস্থ-সবলভাবেই পার করে দিতে পারেন। নিজের পায়ে ভর করে।

একটা সময় তার প্রতি আমার অনেক অভিমান ছিল। কখনো মনে হয়েছে, উনি আমাকে ততটা বোঝেননি, যতটা আমি তাকে বুঝেছি। মনে হয়েছে, সেই বোঝার চেষ্টাটাও তিনি করেননি। কিন্তু সব অভিমানের সে-ট মুছে দিয়েছে এই করোনা।

আমি তার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো হয়েছি, বুড়ো হয়েছি। তবু মনে হয়, যদি পারতাম টিকটিক করে বয়ে চলা সময় ঘড়ির ব্যাটারিটা খুলে রাখতাম! যদি পারতাম, সময়ের কাঁটাটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম, ৫৪ বছর আগে। বিশাল ব্যক্তিত্বের এক ঝলমলে তর"ণটাকে আবার আবিষ্কার করে নিতাম। যে তর"ণ একচিলতে উঠোনে আপনমনে এক্কা-দোক্কা খেলতে ব্যস্ড় কিশোরীটাকে হুট করে বলে বসছে— চলো, বিয়ে করে ফেলি!

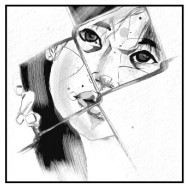

তিনি ছিলেন সিংহের মতো। কী তেজোদীপ্ত! তার ব্যক্তিত্বের ছটায় বাকিসব হয়ে যেত ম□ান। হাঁটতেন ঋজু ভঙ্গিতে। আর কী রাগ ছিল তার। কত-যে বকুনি খেয়েছি! সেই তিনি কেমন শান্ড়-সুবোধ হয়ে গেলেন! এত কম কথা বলেন, সেই বলার ভঙ্গিতে কখনো কখনো ফুটে ওঠে অসহায় এক বালকের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন তিনি অনলাইনে মিটিং করছিলেন। আমি খুশি হলাম। কারণ অনেকদিন পরে তিনি অনলাইনে মিটিং করছেন। আমি তাকে একটু সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। মিটিঙে তিনি কী যেন মন দিয়ে শুনছিলেন। আমি অতটা খেয়াল করিনি। হুট করে মাঝখানে কী যেন বলে ফেলেছি। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তুমি তোমার সংসারটা চালাও, অন্যকিছু চালাতে তোমাকে হবে না। তোমার সংসারের দিকে মনোযোগী হও।'

কাছের মানুষটা এমন রাগ দেখালে বুকের ভেতর চিনচিন তো করেই। কিন্তু আমি খুশিই হলাম। তাকে বললাম, 'তোমার রাগটা এখনো আছে? আমি চাই তুমি সাংঘাতিকভাবে রাগ করো আমার ওপরে। আগের মতো করে রাগ করো। আগের মতো হয়ে যাও। তুমি এটা কী হয়ে গেছ? শুধু একই কথা— পায়ে ব্যথা, হাঁটতে পারি না, হাঁটতে পারি না।' তাকে কত কিছু যে দেখাই, কত কিছু

যে করাই, কিছুতেই তাকে বদলাতে পারি না।